بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ মোতাবেক ১৩ সুলাহ, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

যেমনটি আমি বিগত এক খুতবায় বলেছিলাম, কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের কিছু অংশ রয়ে গেছে, তা বর্ণনা করব। অতএব আজ এই ধারাবাহিকতায় প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.) সম্পর্কে আলোচনা হবে। তিনি **বনু আসাদ** গোত্রের সদস্য ছিলেন। আর (তার) গোত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তিনি **বনু আব্দে শামসের** মিত্র ছিলেন, অথচ কারো কারো মতে তিনি **হারব বিন উমাইয়্যার** মিত্র ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)'র দৈহিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খর্বকায়ও ছিলেন না, তার মাথার চুল খুবই ঘন ছিল। তাকে একটি অভিযানের নেতা নিযুক্ত করার সময় মহানবী (সা.) যে মন্তব্য করেন তা তার (রা.) কষ্টসহিষ্ণুতা, অবিচলতা ও নির্ভীকতার প্রমাণ বহন করে।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাদের ওপর এমন একজনকে নেতা নিযুক্ত করে প্রেরণ করব, যে তোমাদের চেয়ে খুব বেশি ভালো না হলেও ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করার ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে সহিষ্ণু হবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)'র নেতৃত্বে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী **নাখলা উপত্যকা** অভিমুখে যাই। এই অভিযানে সফলতা লাভের পর যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হয় সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে, এই যুদ্ধাভিযান থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিষয়ে কারো কারো অভিমত হলো, এটিই মুসলমানদের অর্জিত প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.) এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে অবশিষ্ট চার ভাগ বিতরণ করে দেন এবং এক ভাগ বায়তুল মালের জন্য রাখেন। ইসলামে এটিই প্রথম **খুমুস** ছিল যা সেদিন নির্ধারণ করা হয়।

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেন, ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকার প্রচলন করেন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)। এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শের অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদই প্রথম সম্পদ যা (মানুষের মাঝে) বণ্টন করা হয়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন (পুস্তকে) তার সম্পর্কে বলেন,

কুরয বিন জাবের মক্কার একজন নেতা ছিল, যে কুরাইশদের একটি দল সাথে নিয়ে পূর্ণ সতর্কতার সাথে মদিনার চারণভূমিতে, যা শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল, অতর্কিত আক্রমণ চালায়, [এটি আরেকটি অভিযানের ঘটনা]; আর মুসলমানদের উট প্রভৃতি তাড়িয়ে নিয়ে যায়। (এই) আকস্মিক আক্রমণ স্বভাবতই মুসলমানদের আতঙ্কিত করে তোলে, কেননা কুরাইশ নেতাদের পক্ষ থেকে পূর্বেই এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, **আমরা মদিনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের ধ্বংস ও বিনাশ করব**, (তাই) মুসলমানরা খুবই চিন্তিত হয় এবং এসব আশঙ্কা দেখে মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে আরো কাছে গিয়ে

তথ্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করেন, যেন এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল সংবাদ যথাসময়ে পাওয়া যায় আর মদিনা সকল প্রকার অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। [আচ্ছা, প্রথমে যে অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছিল সেই বিষয়েই তিনি (রা.) এসব কথা বলছেন।]

তিনি (রা.) বলেন, অতএব এই উদ্দেশ্যেই তিনি (সা.) ৮জন মুহাজেরের একটি দল গঠন করেন এবং পরিস্থিতির নিরিখে এই দলে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের রাখেন যেন কুরাইশদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। আর তিনি (সা.) নিজের ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে এই দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এছাড়া সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ দলটি প্রেরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গোপন রাখার জন্য তিনি (সা.) এই দলটি প্রেরণ করার সময় দলের নেতাকেও বলেন নি যে, তাদের কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, বরং যাত্রার প্রাক্কালে তার (অর্থাৎ আমীরের) হাতে একটি মোহরাঙ্কিত পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য নির্দেশনা লিপিবদ্ধ আছে। [যদিও এই বিবরণের কিছুটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করা হয় নি। যাহোক তিনি (রা.) লেখেন,]

মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা মদিনা থেকে দুদিনের পথ অতিক্রম করার পর এই পত্রটি খুলে এতে (বর্ণিত) নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে। কাজেই আব্দুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গীরা তাদের নেতার নির্দেশানুযায়ী যাত্রা করেন এবং দুদিনের পথ অতিক্রম করার পর আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর ফরমান বা পত্রটি খুলে এসব কথা লিখিত দেখতে পান যে,

"তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাও এবং সেখানে পৌঁছে কুরাইশের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমাদেরকে সেই তথ্য এনে দাও। যেহেতু মক্কার এতটা নিকটে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, (তাই) তিনি (সা.) পত্রের নীচে এই নির্দেশনাও লিখে দেন যে, এই মিশন সম্পর্কে অবগত হবার পর তোমার কোনো সঙ্গী যদি এই দলে যুক্ত থাকতে দ্বিধাবোধ করে এবং ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে দিও। আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা তার সঙ্গীদের পড়ে শোনানোর পর সবাই সমস্বরে বলেন, আমরা সানন্দে এই সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। এরপর এ দলটি নাখলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে তারা **বাহরান** নামক স্থানে পৌঁছলে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)'র উট হারিয়ে যায়। সেগুলো খুঁজতে খুঁজতে তারা তাদের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তারা তাদের (সঙ্গীদের) খুঁজে পান নি। ফলে এই দলের সদস্যসংখ্যা কেবল ৬জনে গিয়ে দাঁড়ায়। [সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র (স্মৃতিচারণের) সময় এই (ঘটনা) আংশিক বর্ণিত হয়েছিল।]

পুনরায় তিনি (রা.) লেখেন, মিস্টার মার্গুলিস এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছে, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং উতবা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উট ছেড়ে দিয়েছিলেন আর এই অজুহাতে তারা পেছনে থেকে যান। তিনি (রা.) লেখেন, ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত (এসব লোক), যাদের জীবনের একেকটি ঘটনা তাদের বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের সাক্ষ্য বহন করে আর যাদের মাঝে একজন বে'রে মঊনার যুদ্ধে কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছেন আর অপরজন অনেকগুলো ভয়াল যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে অবশেষে ইরাক বিজয়ী হন, তাদের সম্পর্কে এমন সন্দেহ পোষণ করা আর শুধুমাত্র নিজের মনগড়া চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে সন্দেহ করা মিস্টার মার্গুলিসেরই শোভা পায়। তিনি (রা.) লেখেন, এখানে মজার বিষয়

হলো, মার্গুলিস সাহেব নিজের বইয়ে এই দাবি করেন যে, আমি সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে এই বইটি লিখেছি। (যাহোক, এই বাক্যটি প্রসঙ্গক্রমে ছিল।) তিনি (রা.) লেখেন, মুসলমানদের ছোট্ট দলটি নাখলা পৌঁছে নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর তাদের মধ্যে কয়েকজন গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে নিজেদের মাথা কামিয়ে ফেলে, যাতে পথচারীরা তাদেরকে উমরা করতে এসেছে মনে করে কোনো প্রকার সন্দেহ না করে। কিন্তু তাদের সেখানে পৌঁছার খুব বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ কুরাইশের ছোট্ট একটি দলও সেখানে এসে উপস্থিত হয় যারা তায়েফ থেকে মক্কা অভিমুখে যাচ্ছিল। ফলে এই দুটি দল পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যায়। (তখন) মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে যে, এখন কী করা উচিত? মহানবী (সা.) তাদেরকে একান্ত গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু অপরদিকে কুরাইশের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আর এখন উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। পরন্তু স্বভাবতই এই আশঙ্কাও ছিল যে, এখন কুরাইশের এই কাফেলাটি যেহেতু মুসলমানদের দেখে ফেলেছে, তাই এই সংবাদ সংগ্রহের বিষয়টিও আর গোপন থাকবে না। এটিও একটি সমস্যা ছিল যে, কোনো কোনো মুসলমানের ধারণা ছিল এটি রজব, অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসের শেষ দিন, যখন আরবের প্রাচীন প্রথা অনুসারে যুদ্ধ হওয়া অনুচিত; কিন্তু কেউ কেউ মনে করেছিল রজব মাস পার হয়ে গেছে এবং শাবান (মাস) শুরু হয়েছে, আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে, এই সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানের জন্য জমাদিউল আখেরে প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে এই দিনটি জমাদিউল আখের না রজব (মাসের) সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। অপরদিকে নাখলার উপত্যকা একেবারে হেরেম তথা মক্কার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। কাজেই এটি স্পষ্ট ছিল যে, আজই যদি কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয় তাহলে আগামীকাল এই কাফেলা মক্কার সীমানায় প্রবেশ করবে, যার সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য হবে। তাই এসব বিষয় চিন্তা করে মুসলমানরা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাফেলার ওপর আক্রমণ করে হয় কাফেলার সদস্যদের বন্দি করা হবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে। তাই তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আক্রমণ করে। এর ফলে কাফেরদের একজন যার নাম ছিল আমর বিন আল্ হাযরামী (সে) নিহত হয় আর দুজন বন্দি হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চতুর্থজন পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং মুসলমানরা তাকে আটক করতে পারে নি, আর এভাবে তাদের পরিকল্পনা সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থ হয়। এরপর মুসলমানরা কাফেলার জিনিসপত্র করায়ত্ত করে। কিন্তু কুরাইশের একজন যেহেতু প্রাণে বেঁচে ফিরে গিয়েছিল আর এটি নিশ্চিত ছিল যে, এই যুদ্ধের সংবাদ দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যাবে, (তাই) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ এবং তার সঙ্গীরা গনিমতের মালপত্র নিয়ে ত্বরিত মদিনা অভিমুখে ফিরে আসেন।

মিস্টার মার্গুলিস এই ঘটনা সম্পর্কে লেখেন, প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সা.) জেনেশুনে এই অভিপ্রায়ে নিষিদ্ধ মাসে এ দলটি প্রেরণ করেছিলেন যে, এই মাসে কুরাইশরা যেহেতু উদাসীন বা অসতর্ক থাকবে, তাই কাফেলা লুট করার সহজ এবং নিশ্চিত সুযোগ মুসলমানরা লাভ করবে। কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝতে পারে যে, এমন ছোট্ট দলকে এত দূরদূরান্তের অঞ্চলে (শুধুমাত্র) লুটপাট করার জন্য পাঠানো সম্ভব নয়, বিশেষভাবে যখন শত্রুদের কেন্দ্র এত নিকটে থাকে। এছাড়া এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, এই দলটি নিছক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছিল আর মহানবী (সা.) যখন এটি জানতে পারেন যে, সাহাবীরা কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছেন তখন তিনি চরম অসন্তুষ্ট হন।

রেওয়ায়েত অনুসারে, এ দলটি যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তিনি পুরো বৃত্তান্ত অবহিত হন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি; আর তিনি (সা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতেও অস্বীকৃতি জানান। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ও তার সঙ্গীরা খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। তারা ভাবেন, আমরা এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছি। সাহাবীরাও তাদেরকে চরম তিরস্কার করে বলেন, তোমরা এমন কাজ করেছো যার নির্দেশ তোমাদের দেয়া হয় নি আর তোমরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করেছো, অথচ এই অভিযানে তোমাদের কোনোভাবেই যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না। অপরদিকে কুরাইশরাও হইচই আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের অবমাননা করেছে। এছাড়া যে ব্যক্তি নিহত হয়েছিল, অর্থাৎ আমর বিন আল্ হাযরামী– সে একজন নেতা ছিল, উপরন্তু সে মক্কার নেতা উতবা বিন রবিআর মিত্রও ছিল। এ কারণেও এই ঘটনাটি কুরাইশদের ক্রোধের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে আর তারা পূর্বের চেয়েও অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কাজেই, বদরের যুদ্ধ মূলত কুরাইশদের এই প্রস্তুতি এবং উত্তেজনা ও শত্রুতার ফলাফল ছিল। মোটকথা, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও কাফের উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বচসা হয় আর পরিশেষে কুরআনের নিম্নোক্ত ওহী অবতীর্ণ হওয়া মুসলমানদের প্রশান্তির কারণ হয়। আর তা হলো এই যে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطَاعُوا (সূরা বাকারা: ২১৮)

অর্থাৎ তারা তোমাকে সম্মানিত মাস সম্পর্কে অর্থাৎ তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, এ (মাসে) যুদ্ধ করা গুরুতর (অপরাধ)। এছাড়া আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং তাঁকে অস্বীকার করা, 'মসজিদুল হারাম' (যেতে) বাধা দেয়া এবং এর (প্রকৃত) অধিবাসীদের এ থেকে বের করে দেয়া আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এর চেয়েও বড় (অপরাধ)। আর নৈরাজ্য সৃষ্টি হত্যার চেয়ে আরো বড় (অপরাধ)। আর তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যদি তাদের জন্য সম্ভব হয়।

অতএব ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিজেদের হত্যামূলক ষড়যন্ত্রসমূহ পবিত্র মাসেও পুরোদমে চালিতে যেত। বরং পবিত্র মাসগুলোর বিভিন্ন সভা ও সফরের সুযোগ নিয়ে তারা এসব মাসে নিজেদের নৈরাজ্যমূলক কর্মকাণ্ডে আরো বেশি সোচ্চার হয়ে যেত, আর চরম নির্লজ্জতার সাথে নিজেদের হৃদয়কে মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার জন্য সেসব সম্মানিত মাসকে তারা নিজ অবস্থান হতে এদিক সেদিক স্থানান্তরিতও করে দিত যেটিকে তারা 'নাসী' নামে অভিহিত করত। এরপর তো মক্কার কাফের ও তাদের সঙ্গীরা সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে হুদাইবিয়ার সন্ধির দৃঢ় চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হেরেমের এলাকায় মুসলমানদের এক মিত্র গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি চালায়। অতঃপর যখন মুসলমানরা সেই গোত্রের পক্ষে বের হয় তখন তাদের বিরুদ্ধেও ঠিক হেরেমের ভেতর তরবারি ব্যবহার করে। অতএব উক্ত উত্তরে মুসলমানরা তো আশ্বস্ত হওয়ারই ছিল, কুরাইশরাও কিছুটা স্তিমিত হয়, আর এরই মাঝে তাদের লোকেরাও নিজেদের দুই বন্দিকে মুক্ত করার জন্য মদিনায় পৌঁছে

যায়। কিন্তু তখনও যেহেতু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং উতবা ফিরে আসেন নি আর মহানবী (সা.) তাদের বিষয়ে চরম শঙ্কিত ছিলেন যে, তারা যদি কুরাইশদের হাতে (ধরা) পড়েন তাহলে কুরাইশরা তাদেরকে জীবিত ছাড়বে না। তাই তিনি (সা.) তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমার লোকেরা সুরক্ষিতভাবে মদিনায় পৌঁছলে আমি তোমাদের লোকদের মুক্ত করে দেব। অতএব যখন তারা দুজন ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া গ্রহণ করে উভয় বন্দিকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু সেই বন্দিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির ওপর মদিনায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র আর ইসলামী শিক্ষার সত্যতার এতটা গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, সে মুক্ত হওয়ার পরও ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় আর মহানবী (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর অবশেষে বে'রে মঊনায় শহীদ হয়। তার নাম ছিল হাকাম বিন কীসান।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের তরবারি উহুদের যুদ্ধের দিন ভেঙে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) তাকে 'উরজূন', অর্থাৎ খেজুরের একটি শাখা দেন, আর সেটি তার হাতে তরবারির ন্যায় হয়ে যায়। সেদিন থেকেই তিনি 'উরজূন' উপাধিতে প্রসিদ্ধি পান।

আবু নঈম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ নিজ প্রভুর নামে প্রতিজ্ঞাকারী আর খোদার ভালোবাসাকে নিজ হৃদয়ে স্থান দানকারী এবং সর্বপ্রথম ইসলামী পতাকা প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন।

ইমাম শা'বীর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমার কাছে বনী আমের এবং বনী আসাদের দুই ব্যক্তি পরস্পরের সাথে গর্ব ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ করতে করতে আগমন করে। বনী আমেরের ব্যক্তি বনী আসাদের ব্যক্তির হাত ধরে রেখেছিল। আসাদ গোত্রের ব্যক্তি বলছিল, আমার হাত ছেড়ে দাও। অপরদিকে আমের গোত্রের লোক বলছিল, খোদার কসম! আমি আপনাকে ছাড়ব না। তখন ইমাম শা'বী বলেন, আমি তাকে বলি, হে বনী আমেরের ভাই! তাকে ছেড়ে দাও, এবং আসাদ গোত্রের ব্যক্তিকে বলি, তোমার ছয়টি বৈশিষ্ট্য এমন যা পুরো আরবে কারো মাঝে নেই। সেগুলো হলো, প্রথম– তোমাদের মধ্য থেকে এক মহিলাকে মহানবী (সা.) বিয়ে করতে চাইলে আল্লাহ্ তা'লা তা করিয়েছেন আর তাদের উভয়ের মাঝে দূত ছিলেন হযরত জিব্রাঈল। আর সেই মহিলা ছিলেন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.); এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়। দ্বিতীয়– তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ছিলেন জান্নাতী কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তিনি বিনয়ের সাথে চলতেন, আর তিনি ছিলেন হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)। আর এটি তোমাদের জাতির জন্য গর্বের বিষয়। তৃতীয়– ইসলামে সর্বপ্রথম পতাকা, অর্থাৎ নিশান যা দেয়া হয়েছে তা-ও তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শকে দেয়া হয়েছে, আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়। চতুর্থ– সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা ইসলামে বণ্টন করা হয়েছে তা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। পঞ্চম– বয়আতে রিযওয়ানে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বয়আত করে সে তোমাদের জাতির সদস্য ছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যেন আমি আপনার বয়আত করতে পারি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন্ কথার ওপর আমার বয়আত করবে? সে উত্তরে বলে, যা আপনার হৃদয়ে রয়েছে। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আমার হৃদয়ে কী আছে? সে উত্তর দেয়, বিজয় বা শাহাদাত। সুতরাং হযরত আবু সিনান মহানবী (সা.)-

এর নিকট বয়আত করেন। এরপর মানুষ আসত আর বলত, হযরত আবু সিনান (রা.)'র বয়আতের শর্তানুযায়ী আমরাও বয়আত করছি। আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়। ষষ্ঠ– বদরের যুদ্ধে ৭জন মুহাজের তোমাদের জাতির ছিল আর এটি তোমার জাতির জন্য গর্বের বিষয়।

অতঃপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন তখন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.) তার স্ত্রী ছিলেন। তার শাহাদাতের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.)-কে বিয়ে করে নেন। তিনি ৮ মাস রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ছিলেন; আবার এটিও বলা হয় যে, ২-৩ মাস ছিলেন এবং রবিউল আখের মাসের শেষের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। যেমনটি আমি বলেছি, তার বাকি স্মৃতিচারণ পূর্বে করা হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত সালেহ শুকরান (রা.)'র। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) নিজ পিতার পক্ষ থেকে হযরত শুকরান ও হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-কে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন; তারা ক্রীতদাস ছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর যেসব ব্যক্তি (তাঁকে) গোসল করানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত সালেহ শুকরান (রা.)-ও ছিলেন। তিনি ছাড়া আরো ৮জন আহলে বায়তের সদস্যও ছিলেন।

মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সালেহ (রা.) আরেকটি সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। [অর্থাৎ সেই গোসল দেয়ার বিষয়েই যার উল্লেখ করা হয়েছে] তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন গোসল করানো হচ্ছিল তখন যেসকল সাহাবী পানি ঢালছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সালেহ শুকরান ও হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) ছিলেন।

অতএব রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, মানুষ যখন মহানবী (সা.)-কে গোসল করানোর জন্য একত্রিত হয় তখন ঘরে কেবল মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্যরাই ছিলেন। নবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস ও হযরত আলী, হযরত ফযল বিন আব্বাস, হযরত কুসুম বিন আব্বাস, হযরত উসামা বিন যায়েদ এবং হযরত সালেহ শুকরান, (যিনি) তাঁর (সা.) মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। এরই মাঝে ঘরের দরজায় দাঁড়ানো বনু অওফ বিন খাযরাজ গোত্রের হযরত অওস বিন খওলী আনসারী, যিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হযরত আলী (রা.)কে ডেকে বলেন, হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে আমাদের অংশও রাখুন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে বলেন, ভেতরে এসো। ফলে তিনিও ভেতরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.)-কে গোসল করানোর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু গোসল করানোর কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আলী (রা.) তার বুক দিয়ে মহানবী (সা.)-এর দেহকে ঠেক দিয়ে রাখেন আর মহানবী (সা.)-এর জামা তাঁর গায়েই ছিল। হযরত আব্বাস (রা.), ফযল (রা.) এবং কুসুম (রা.) হযরত আলী (রা.)'র সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলেন। হযরত উসামা (রা.) এবং হযরত

সালেহ শুকরান (রা.) পানি ঢালছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে (সা.) গোসল করাচ্ছিলেন।

আল্লামা বালাযুরী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উমর (রা.) হযরত শুকরান (রা.)'র সুপুত্র আব্দুর রহমান বিন শুকরান (রা.)-কে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)'র কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে লেখেন, তোমার কাছে এক পুণ্যবান ব্যক্তি সালেহ শুকরান (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমানকে পাঠাচ্ছি যিনি মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টিতে তাঁর পিতার যে মর্যাদা ছিল সেই মর্যাদা দৃষ্টিপটে রেখেই তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে আল্লামা বাভী বলেন, হযরত শুকরান (রা.) মদিনায় বসতি স্থাপন করেন আর বসরাতেও তাঁর একটি বসতবাড়ি ছিল। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

তাঁর বংশের শেষ ব্যক্তি হারুন অর রশীদের যুগে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। একইভাবে বসরায়ও তাঁর বংশের এক ব্যক্তি বসবাস করত। মুসআব বলেন, তাঁর বংশধারা চলমান ছিল কি না তা আমি জানি না।

হযরত সালেহ শুকরান (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে আমি একটি গাধার পিঠে বসে খায়বারের দিকে যেতে দেখেছি আর তখন তিনি (সা.) ইশারায় নামায আদায় করছিলেন [অর্থাৎ বাহনে বসে নামায পড়ছিলেন। বাহনে বসে নামায পড়া যায় কি না– এটিও একটি মাসলা।]

হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.)-ও একজন সাহাবী যার স্মৃতিচারণের কিছুটা উল্লেখ করা বাকি আছে। তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.)'র নাম হযরত মালেক বিন দুখায়শিন এবং ইবনে দুখশুনও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পিতার নাম দুখশুম বিন মারযাখা আর তাঁর নাম দুখশুম বিন মালিক বিন দুখশুম বিন মারযাখাও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমায়রা বিনতে সা'দ। হযরত মালেক (রা.)'র বিয়ে জামিলা বিনতে উবাই বিন সলুলের সাথে হয়েছিল যিনি মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের সহোদরা ছিলেন। সুহায়েল বিন আমরকে বন্দি করার সময় হযরত মালেক (রা.) এই পঙক্তি পড়েছেন,

اسرت سهلا فلا ابتغی ۔۔۔ اسیرا بہ من جمیع الامم

و خندف تعلم ان الفتی ۔۔۔ فتاها سهیل اذا یظلم

ضربت بذی الشفر حتی انثنی ۔۔۔ و اکرهت نفسی علی ذی العلم

অর্থাৎ আমি সুহায়েলকে বন্দি করেছি এবং তার পরিবর্তে সমগ্র মানবমণ্ডলীর আর কাউকে আমি বন্দি করতে চাই নি। বনু খন্দফ জানে, সুহায়েলই তার গোত্রের সাহসী যুবক, যখন তার ওপর জুলুম করা হয়। আমি পতাকা বহনকারীর ওপর আঘাত করলে সে একদিকে ঝুঁকে যায়, আর ঠোঁট কাটা সুহায়েল বিন আমরের সাথে যুদ্ধ করতে নিজেকে আমি বাধ্য করেছি।

বদরের বন্দিদের সম্পর্কে উসুদুল গাবা পুস্তকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আবু সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আবু ইউসর, মালেক বিন দুখশুম অওফী এবং তারেক বিন উবায়েদ আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে কাউকে

হত্যা করবে সে এতটা অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি কাউকে বন্দি করবে সে এতটা পাবে। আর আমরা ৭০ জনকে হত্যা করেছি এবং ৭০ জনকে বন্দি করেছি। তখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরাও তাদের মতো করতে পারতাম কিন্তু আমরা এমনটি করি নি, কারণ আমরা পিছন দিক থেকে মুসলমানদের সুরক্ষা করছিলাম। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ স্বল্প এবং মানুষের সংখ্যা অনেক। আপনি যদি তাদেরকে ততটা প্রদান করেন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন তাহলে কতক লোক কিছুই পাবে না। অতএব তাদের কথা বলা অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'লা (নিম্নোক্ত) আয়াত অবতীর্ণ করেন, **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ** (সূরা আনফাল: ০২) অর্থাৎ হে রসূল! মানুষ তোমার কাছে আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের।

উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন হযরত খারজা মারাত্মক আহত অবস্থায় বসেছিলেন। তার শরীরে ১৩টির মতো প্রাণঘাতি আঘাত লেগেছিল। হযরত মালেক তাকে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারজা বলেন, তাঁকে (সা.) যদি শহীদ করা হয়ে থাকে তাহলে (জেনে রাখো!) নিশ্চয় আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। মহানবী (সা.) তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। **ফাকাতিলু আন দ্বীনিকা**- তাই তোমরাও নিজ ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো। অপর এক রেওয়ায়েতে এ ঘটনার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর শহীদ হওয়ার গুজব যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন হযরত মালেক বিন দুখশুম হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন তিনি বসেছিলেন এবং তার বুকে ১৩টি প্রাণহারী আঘাত লেগেছিল। হযরত মালেক (রা.) তাকে বলেন, তুমি কি জানো না যে, মহানবী (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে? হযরত খারজা উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যদি শহীদ হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। নিশ্চয় তিনি (সা.) বাণী, অর্থাৎ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব নিজ ধর্মের জন্য জিহাদ করো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মালেক, হযরত সা'দ বিন রবী (রা.)'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন আর তিনি ১২টি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। হযরত মালেক (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তুমি কি জানো যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন? হযরত সা'দ (রা.) উত্তরে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তোমাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো, কেননা আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যক লোকের মধ্য থেকে প্রায় সবাই মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, তিনি অর্থাৎ হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.) মুনাফিকদের আশ্রয়দাতা। এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সে কি নামায পড়ে না? [তোমরা তাকে মুনাফিক বলছো; সে কি নামায পড়ে না?] তখন লোকেরা বলে, জ্বী, (পড়ে,) হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কিন্তু সে এমন নামায পড়ে যার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি (সা.) দুইবার বলেন, যারা নামায পড়ে তাদেরকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। [এটি বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয়।]

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মালেক বিন দুখশুম (রা.)'র সাথে হযরত মাআন বিন আদী (রা.)'র ভাই হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে মসজিদে যিরার

ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মালেক (রা.) সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তার বংশ এগোয় নি।

এরপর রয়েছে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)'র স্মৃতিচারণ। তাঁর স্মৃতিচারণ অল্পই বাকি আছে। তার নাম ছিল উকাশা, মিহসান বিন হুরসান ছিল তার পিতার নাম। তার ডাকনাম ছিল আবু মিহসান।

হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে দ্বাদশ হিজরি সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইমাম শা'বী উকাশার পরিচয় যে ভাষায় দিয়েছেন তা হলো, এক ব্যক্তি জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করতেন আর তিনি হলেন, উকাশা বিন মিহসান (রা.)।

দ্বিতীয় হিজরি সনে বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পর রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্শ (রা.)-কে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধাভিযানে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সীরাতে হালবিয়াতে উল্লেখ আছে, উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজ ধনুক দিয়ে অনবরত তির নিক্ষেপ করছিলেন যার নাম ছিল কাতুম। কেননা এথেকে তির নিক্ষেপের সময় কোনো শব্দ হতো না। অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে অবশেষে এই ধনুকের একটি অংশ ভেঙে যায়। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তাঁর এই ধনুকের এক মাথা ভেঙে গিয়েছিল যাতে তন্ত্রী বাঁধা হয়। যাহোক, অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে সেই ধনুক ভেঙে যায়। তাঁর হাতে ধনুকের এক বিঘত পরিমাণ তন্ত্রী অবশিষ্ট ছিল। হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.) ধনুকের তন্ত্রী বাঁধার জন্য তাঁর (সা.) কাছ থেকে তা নেন, কিন্তু সেই রশিটি ছোট ছিল। তখন তিনি তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ রশিটি তো ছোট। তিনি (সা.) বলেন, এটি (ধরে) টানো, (দেখবে) লম্বা হয়ে যাবে। হযরত উকাশা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি সেই রশিটি টান দিলে এতটা দীর্ঘ হয়ে যায় যে, আমি তা দিয়ে ধনুকের মাথায় ২-৩টি প্যাঁচও দিই এবং খুব ভালোভাবে তা বেঁধে ফেলি।

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, ষষ্ঠ হিজরি সনে উয়ায়না বিন হিসন গাতফানের অশ্বারোহীদের সাথে নিয়ে গাবায় মহানবী (সা.)-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলোর ওপর আক্রমণ করে। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উটগুলো চরে বেড়াত, অর্থাৎ চারণভূমি ছিল। গাবায় বনু গাফফার গোত্রের একজন পুরুষ ও মহিলা থাকত। শত্রুরা আক্রমণ করে পুরুষ লোকটিকে হত্যা করে মহিলাকে উটনীগুলোর সাথে নিয়ে যায়। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত সালামা বিন আকওয়া সর্বপ্রথম অবগত হয়েছিলেন। প্রভাতে তিনি গাবার উদ্দেশ্যে বের হন আর তার সাথে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)'র দাস এবং তার সাথে ঘোড়া ছিল। সানিয়াতুল বিদা (নামক স্থানে) পৌঁছে তারা যখন আক্রমণকারীদের কয়েকটি ঘোড়া দেখতে পান, তখন সালা পাহাড়ের একদিক থেকে উপরে আরোহণ করেন এবং সাহায্যের জন্য পিছনে থাকা তার লোকদের ডাকেন। এরপর তারা শিকারি প্রাণীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণকারী দলের পিছু ধাওয়া করেন, এমনকি তাদেরকে (নাগালের ভেতর) পেয়ে যান এবং তাদের ওপর তির নিক্ষেপ আরম্ভ করেন। অশ্বারোহীরা তার দিকে দৃষ্টি দিলেই হযরত সালামা (রা.) লুকিয়ে যেতেন এবং ফিরে আসতেন আর সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি (আবার) তির নিক্ষেপ করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এই ঘটনার সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.)-ও মদিনায় ঘোষণা করেন যে, বিপদ আসন্ন। অশ্বারোহীরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসতে থাকে।

এসব অশ্বারোহীর মাঝে হযরত উকাশা বিন মিহসান এবং অন্যান্য সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধে হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.) উবার এবং তার পুত্র আমর বিন উবারকে ধরে ফেলেন। তারা উভয়ে একই উটে আরোহিত ছিল। হযরত উকাশা (রা.) একটি বর্ষা দিয়েই তাদের উভয়কে গেঁথে ফেলেন এবং হত্যা করেন আর ছিনতাইকৃত কিছু উটনী ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

এরপর রয়েছে হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.)'র স্মৃতিচারণ। তার ডাকনাম ছিল আবু যায়েদ। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত খারজা বিন যায়েদ (রা.) ইহুদিদের কয়েকজন আলেমের কাছে তওরাতে উল্লিখিত কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যার উত্তর দিতে সেসব আলেম অস্বীকার করে এবং সত্যকে গোপন করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (সূরা বাকারা: ১৬০)

নিশ্চয় যারা আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং পথ-নির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি তা গোপন করে, এতদসত্ত্বেও যে, আমরা মানুষের জন্য কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি তাদেরকেই আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

এরপর রয়েছে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.)'র স্মৃতিচারণ। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বিয়াযা বিন আমেরের সদস্য ছিলেন। তার বংশধর মদিনা এবং বাগদাদের বাসিন্দা ছিল। তার সম্পর্কে লেখা রয়েছে, যোহাক বিন নো'মান বর্ণনা করেন, মাসরূক বিন ওয়ায়েল আকীক উপত্যকা থেকে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদিনায় আসেন। [আকীক হলো আরবের কয়েকটি উপত্যকা, খনি এবং অন্যান্য কিছু স্থানের নাম; সবচেয়ে বিখ্যাত হলো মদিনার ঠিক পশ্চিম দিকে অবস্থিত আকীক উপত্যকা। যাহোক মহানবী (সা.)-এর যুগে মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথটি এই আকীক (উপত্যকা)-এর ওপর দিয়েই যুল হুলাইফা পৌঁছতো, বর্তমান যুগের রাস্তাও এটিই; বর্ণনাকারী এই কথা লেখেন]। আর (তিনি) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি চাই, আমার জাতির কাছে আপনি এমন একজন লোক প্রেরণ করবেন যিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবেন। ফলে মহানবী (সা.) তাদের কাছে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত যিয়াদ (রা.) ৪১ হিজরি সনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)'র শাসনামলের প্রথম দিকে পরলোকগমন করেন।

তিবরানী বলেন, হযরত যিয়াদ (রা.) কুফায় ছিলেন, কিন্তু মুসলিম ও ইবনে হাব্বান বলেন, তিনি সিরিয়াতে ছিলেন। ইবনে হাব্বান আরো বলেন, তিনি (রা.) ফকীহ্ এবং সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোনো একটি বিষয়ের উল্লেখ করার পর বলেন, এ বিষয়টি জ্ঞান উঠে যাওয়ার পর সংঘটিত হবে। তখন আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! জ্ঞান কীভাবে উঠে যাবে? অথচ আমরা পবিত্র কুরআন পাঠ করি এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াই আর আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পড়াবে। পবিত্র কুরআনের বিদ্যমানতায় জ্ঞান কীভাবে উঠে যেতে পারে? একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে যিয়াদ, আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন!

আমি তোমাকে মদিনার সর্বাধিক বিজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম। এসব ইহুদি ও খ্রিষ্টনরা কি তাদের উভয়ের মাঝে বিদ্যমান তওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে না? (কিন্তু তারা) এর কোনো নির্দেশের অনুসরণ করে না। জ্ঞান তখন উঠে যাবে যখন পবিত্র কুরআন পড়া হবে ঠিকই, কিন্তু মুসলমানরা (এর নির্দেশের) অনুসরণ করবে না। [আর বর্তমানে আমরা এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি।]

ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কুসায়েদের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)-কে পাঁচশত মুসলমানের সাথে হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) এবং হযরত মুহাজের বিন উমাইয়্যা বিন আবি উমাইয়্যা (রা.)'র সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (রা.) তখন গিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট পৌঁছেন যখন তারা ইয়েমেনে অবস্থিত নুজায়ের অঞ্চল জয় করে নিয়েছিলেন। তথাপি হযরত যিয়াদ বিন লাবীদ (রা.) তাঁকে গনিমতের মাল থেকে অংশ দিয়েছিলেন। [বিজয় লাভের পর এই কাফেলা পৌঁছেছিল।]

ইমাম শাফী বলেন, হযরত যিয়াদ (রা.) এ বিষয়টি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখেছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে উত্তরে লিখেছিলেন, গনিমতের সম্পদে শুধু তাদেরই অধিকার রয়েছে যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে ইকরামা (রা.)'র জন্য এতে কোনো অংশ নেই, কেননা তিনি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। হযরত যিয়াদ (রা.) তার সঙ্গীদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন, তখন তারা ইকরামা এবং তার সৈন্যদলকে সানন্দে এই গনিমতের সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)'র। বুকায়ের বিন আব্দে ইয়ালীল তাঁর পিতা ছিলেন। তিনি বনী আদী (গোত্রের) মিত্র বনু সা'দ গোত্রের সদস্য ছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা আইয়াস ও তার ভাইদের মধ্যে আকেল, খালেদ এবং আমের ব্যতীত অন্য এমন কোনো চারজন ভাইকে চিনি না যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই চার ভাই একসাথে হিজরত করেছিলেন এবং মদিনাতে রিফাআ বিন আব্দিল মুনযেরের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, উহুদের যুদ্ধের পর আযল ও কারা গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের মাঝে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে, আপনি আমাদের সাথে নিজ সাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন যেন তারা আমাদের জাতিকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয় এবং কুরআন পড়ায়। মহানবী (সা.) হযরত মারসাদ বিন আবি মারসাদ (রা.)'র নেতৃত্বে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত খালেদ বিন বুকায়ের (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা ধর্ম শেখার জন্য নিয়ে গিয়েছিল তারা এদেরকে ধোঁকা দিয়ে শহীদ করেছিল।

এরপর রয়েছে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র স্মৃতিচারণ। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু ইয়াকযান। তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে লিখেছেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) আম্মার নামের এক ক্রীতদাসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং চোখ মুছছে। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আম্মার! কী ব্যাপার? আম্মার বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খুবই জঘন্য বিষয়। তারা, অর্থাৎ শত্রুরা আমাকে অনবরত মেরেছে এবং কষ্ট দিয়েছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ে নি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মুখ থেকে আপনার বিরুদ্ধে এবং দেবতাদের পক্ষে কিছু কথা

বের করে নিয়েছে। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু সেই সময় তুমি নিজ অন্তরে কী অনুভব করতে? আম্মার বলেন, হৃদয়ে এক অটল ঈমান অনুভব করতাম। যদিও মুখে আমি আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলে দিয়েছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে ঈমান ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হৃদয় যদি ঈমানে পূর্ণ থাকে তাহলে খোদা তা'লা তোমার দুর্বলতা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় হিজরতে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালের নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফা সানী (রা.) বলেন, এই নৈরাজ্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে আর সাহাবীরাও (রা.) এমন চিঠিপত্র পেতে থাকেন যাতে গভর্নরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ থাকত, তখন তারা সম্মিলিতভাবে হযরত উসমান (রা.)'র সমীপে নিবেদন করেন, আপনি কি জানেন না যে, (মদিনার) বাহিরে কী হচ্ছে? তিনি বলেন, আমার কাছে যেসব রিপোর্ট আসে তা তো ভালো চিত্রই তুলে ধরে। সাহাবীরা (রা.) উত্তরে বলেন, আমাদের কাছে বাইরে থেকে অমুক অমুক বিষয় সংবলিত চিঠিপত্র আসে; এর তদন্ত হওয়া উচিত। হযরত উসমান (রা.) তখন তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, কীভাবে তদন্ত করা যায়? তাদের পরামর্শ অনুসারে উসামা বিন যায়েদকে বসরায়, মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে কূফায়, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে সিরিয়ায় এবং আম্মার বিন ইয়াসেরকে তিনি মিশরে প্রেরণ করেন, যেন তারা সেখানকার অবস্থা তদন্ত করে রিপোর্ট করেন যে, আসলেই কি আমীররা প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে এবং জনগণের অধিকার হরণ করে? আর এই চারজন ছাড়াও আরো কিছু লোককে তিনি বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন যেন (তারা তাঁকে) সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন।

তারা যান এবং তদন্ত শেষে সবাই ফিরে এসে যে রিপোর্ট দেন তা হলো, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে এবং মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছে। এছাড়া তাদের প্রাপ্য অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করে না আর শাসকেরা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। কিন্তু আম্মার বিন ইয়াসের বিলম্ব করেন এবং তার পক্ষ থেকে কোনোরূপ সংবাদ আসে নি। তার পক্ষ থেকে সংবাদ আসতে এত বেশি বিলম্ব হয় যে, এর ফলে মদিনাবাসী মনে করে, তিনি হয়ত মারা গিয়ে থাকবেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি তার সরলতাবশত ও রাজনীতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় সেই নৈরাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দেন যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার শিষ্য ছিল। মিশরে যেহেতু স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা উপস্থিত ছিল আর সে এ বিষয়ে অসতর্ক ছিল না যে, এই তদন্তকারী প্রতিনিধিদল যদি গোটা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকার সিদ্ধান্ত প্রদান করে তাহলে সব মানুষ আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত এমন আকস্মিকভাবে হয়েছিল যে, অন্যান্য অঞ্চলে সে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে নি। কিন্তু মিশরে ব্যবস্থা করা তার জন্য সহজ ছিল। আম্মার বিন ইয়াসের মিশরে প্রবেশ করতেই সে তাকে স্বাগত জানায় এবং মিশরের গভর্নরের দুর্নাম ও অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে আরম্ভ করে। তিনি (রা.) (নিজেকে) তার জাদুকরী কথার প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। [সে এমনভাবে কথা বলেছে যে, তাঁর ওপর তার কথার জাদু কার্যকরী সাব্যস্ত হয়। সে একজন সুবক্তা ছিল।] একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা তো দূরের কথা তিনি মিশরের শাসকের নিকটেই যান নি আর সাধারণ তদন্তও করেন নি। বরং এই নৈরাজ্যবাদী দলের

সাথেই তিনি চলে যান এবং তাদের সাথে মিলে আপত্তি করতে আরম্ভ করেন। সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে যদি নিশ্চিতভাবে সেই নৈরাজ্যকারী দলের ফাঁদে পা দিতে দেখা যায় তবে তিনি হলেন একমাত্র আম্মার বিন ইয়াসের। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রসিদ্ধ সাহাবী এ কাজে অংশগ্রহণ করেন নি, আর যদি কারো সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েও থাকে তাহলে তা অন্য রেওয়ায়েত দ্বারা খণ্ডনও হয়ে গেছে। আম্মার বিন ইয়াসেরের তাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত হওয়ার বিশেষ একটি কারণ ছিল। [এমনটি নয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্! তাঁর মাঝে কোনো কপটতা ছিল, বরং একটি কারণ ছিল আর তা হলো] মিশরে পৌঁছামাত্রই তার সাথে একদল বাহ্যত বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত বাকপটু লোকের সাক্ষাৎ হয় যারা তার নিকট অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মিশরের শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আরম্ভ করে। ঘটনাচক্রে মিশরের শাসক এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কোনো এক সময় মহানবী (সা.)-এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং তার সম্পর্কে তিনি (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কাবা শরীফে পাওয়া গেলেও তাকে যেন হত্যা করা হয়। যদিও তিনি (সা.) পরবর্তীতে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তথাপি তার প্রাথমিক যুগের বিরোধিতার বিষয়টি কতক সাহাবীর হৃদয়ে তখনও সজীব ছিল, যাদের মাঝে আম্মারও অন্যতম। সুতরাং এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা শুনে আম্মার খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়ে যান এবং তার প্রতি যেসব আপত্তি আরোপ করা হয়েছিল তা সঠিক মনে করেন, আর (তাঁর) এই প্রকৃতিগত অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে সাবায়ী, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার সাথিরা তার (অর্থাৎ মিশরের শাসকের) বিরুদ্ধে এসব কথার প্রতি বিশেষ জোর দিত। [তাদের সাথে তিনিও যুক্ত হয়ে যান]।

কিন্তু একথাও লেখা আছে যে, সিফফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) মানুষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির প্রতি ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে না– তারা কোথায়? একথা বলার পর একদল লোক তার পাশে এসে একত্র হয়। হযরত আম্মার (রা.) তাদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! আমাদের সাথে তোমরা তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো যারা হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)'র হত্যার বিচার দাবি করছে আর তারা মনে করে, হযরত উসমান (রা.) নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হয়েছেন! আল্লাহ্‌র কসম! হযরত উসমান (রা.)'র হত্যার বিচার তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং তারা জাগতিকতার স্বাদ গ্রহণ করেছে। এপর্যায়ে এসে তিনি (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, নৈরাজ্যবাদীরা কী পরিমাণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, তারা একে, অর্থাৎ জাগতিকতাকেই ভালোবাসে আর এর পেছনেই তারা ছুটছে। তারা জেনে গেছে, তাদের বিষয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাই এই সত্য তাদের ও তাদের জাগতিক বিষয়াদির মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, আর ইসলামে অন্যদের ওপর এরা এমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না যার ভিত্তিতে এরা মুসলমানদের আনুগত্য ও নেতৃত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে। [এরা আমীর নিযুক্ত হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই রাখে না, বরং এরা কেবল নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।] এরা তাদের অনুসারীদের একথা বলে প্রতারিত করেছে যে, আমাদের ইমামকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, যেন এরা নিজেরা অত্যাচারী শাসক হতে পারে; আর এটি এমন একটি চক্রান্ত যার মাধ্যমে এরা এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যা তোমরা দেখছো। এরা যদি হযরত উসমান (রা.)'র কিসাসের দাবি উত্থাপন না করত তাহলে মানুষের মধ্য থেকে দুজনও তাদের অনুসরণ করত না। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাদের সাহায্য করো যেভাবে তুমি অনেকবার সাহায্য করেছো–

(তবে তো ভালো); কিন্তু তুমি যদি তাদের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সফলতা দান করো তবে তাদের জন্য তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত রাখো, কেননা তোমার বান্দাদের মাঝে তারা নতুন কথার প্রচলন করেছে।

মুহাম্মদ বিন আমর প্রমুখ থেকে বর্ণিত, সিফফীনের যুদ্ধে চরম যুদ্ধ হচ্ছিল আর উভয় দলই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। মুয়াবিয়া বলেন, এটি সে দিন যখন পুরো আরব ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে এই ক্রীতদাস তথা আম্মার বিন ইয়াসেরের দুর্বলতা পেয়ে বসলে ভিন্ন কথা; [অর্থাৎ হযরত আম্মারকে শহীদ করা হলে ভিন্ন কথা]। তিন দিন ও তিন রাত্রি চরম যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিন চলাকালীন সময় পতাকা বহনকারী হাশেম বিন উতবা বিন আবি ওয়াক্কাসকে হযরত আম্মার বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত! আমাকে তুমি সাথে নিয়ে চলো। হাশেম বলেন, হে আম্মার! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন। আপনি এমন ব্যক্তি যুদ্ধে যাকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা হয়। আমি তো এই আকাঙ্ক্ষায় পতাকা নিয়ে যাব যেন এর মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। আমি দুর্বলতা প্রদর্শন করলেও মৃত্যু থেকে নিরাপদ নই। তিনি তার বাহনে আরোহণ করা পর্যন্ত তারা একত্রেই ছিলেন। তিনি নিজের সাথে তাকে তার বাহনে উঠিয়ে নেন। অতঃপর হযরত আম্মার নিজ সৈন্যবাহিনীতে দাঁড়ান। যুল কালা তার নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এরা দুজন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। উভয় সৈন্যবাহিনীই ধ্বংস হয়ে যায়। হাওয়াই সাকী ও আবু গাদিয়া মুযনী হযরত আম্মারের ওপর আক্রমণ করে আর এরা দুজন তাকে শহীদ করে। আবুল গাদিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সে কীভাবে হত্যা করেছে? উত্তরে সে বলে, তিনি যখন নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হন এবং আমরা তার নিকটবর্তী হই, তখন তিনি হাঁক দিয়ে বলেন, সম্মুখ যুদ্ধ করার মতো কেউ আছে কি? ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে সিকাসেক, সে গোত্র থেকে এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়। তারা দুজন পরস্পরের ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করেন। অতঃপর হযরত আম্মার সাকসাকীকে হত্যা করেন। এরপর তিনি পুনরায় সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান জানান, এখন কে মুখোমুখি হতে আগ্রহী? ইয়েমেনের আরেকটি গোত্রের নাম হিমইয়ার। সে গোত্র থেকেও একজন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়। দুজনই পরস্পরের ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করেন। আম্মার হিমইয়ারিকে হত্যা করেন। হিমইয়ারি তাকে আহত করে দিয়েছিল। এরপর তিনি আবারও আহ্বান জানান, আর কে সম্মুখ যুদ্ধে আগ্রহী? আমি তার দিকে এগিয়ে যাই, [ক্রীতদাস একথা বলছে,] আমরা পরস্পরকে তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি। তার হাত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আমি তার ওপর সজোরে দ্বিতীয় আক্রমণ করি যার ফলে তিনি পড়ে যান। এরপর আমি তাকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করি যে, তিনি নিস্তব্ধ হয়ে যান। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আম্মারকে যখন শহীদ করা হয় তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, মুসলমানদের মাঝে যে ব্যক্তি হযরত আম্মারের শাহাদাতকে অস্বাভাবিক জ্ঞান করে না এবং এ ঘটনায় ব্যথিত হয় না– সে নিঃসন্দেহে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। আম্মারের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা বর্ষণ করুন; যেদিন থেকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ্ আম্মারের প্রতি রহম করুন; যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চারজন সাহাবীর স্মরণ করা হতো তখন চতুর্থ নাম তার থাকত, আর পাঁচজন সাহাবীর উল্লেখ করা হলে পঞ্চম নাম তার হতো। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোনো একজন বা দুজনেরও এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, বিভিন্ন সময়ে আম্মারের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে। সুতরাং আম্মারের জন্য জান্নাত মোবারক হোক এবং তাঁর

সম্পর্কে বলা হয়েছে, আম্মার সত্যের সাথে রয়েছেন এবং সত্য আম্মারের সাথে রয়েছে, আর আম্মার যেখানেই যাবে সত্যকে অবলম্বন করেই যাবে এবং আম্মারের হত্যাকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

সাঈদ বিন আব্দুর রহমান নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র নিকট এসে বলে, আমি তো জুনুবী (অর্থাৎ অপবিত্র) অবস্থায় আছি, কিন্তু আমি পানি পাই নি। এটি শুনে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলেন, আপনার কি মনে নেই যখন আমরা, অর্থাৎ আমি এবং আপনি একটি সফরে ছিলাম; আপনি নামায পড়েন নি কিন্তু আমি মাটিতে পশুর ন্যায় গড়াগড়ি করে এরপর নামায পড়ে নিই। [মূলত পানি না থাকার কারণে এমনটি করেন, অর্থাৎ তায়াম্মুম করেন।] আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এর উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তোমার শুধু এটুকু করাই যথেষ্ট ছিল– একথা বলে তিনি (সা.) তাঁর দুহাত মাটিতে মারার পর তাতে ফুঁ দেন আর নিজ মুখ এবং দুহাত মাসাহ্ (মর্দন) করেন।

আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আম্মার আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন আর সংক্ষিপ্তাকারে দিয়েছেন, কিন্তু বাগ্মিতাপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি মিম্বর থেকে নীচে নামলে আমরা তাকে বলি, হে আবু ইয়াকযান! আপনি খুব বাগ্মিতাপূর্ণ কথা বলেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করেছেন; আপনি এটি দীর্ঘ করলেন না কেন? তখন তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির দীর্ঘ নামায এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা তার বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তাই নামায দীর্ঘ করো আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করো। নিশ্চয় কিছু বক্তৃতা জাদুর কাজ করে।

হাসান বিন বিলাল বলেন, আমি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে দেখেছি, তিনি ওযু করার সময় দাড়ি খিলাল করেছেন। অর্থাৎ দাড়িতে আঙুল চালিয়েছেন। তাকে বলা হয় কিংবা বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বলি, আপনি কি আপনার দাড়ির খিলাল করছেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আমি কেন দাড়ি খিলাল করব না, যেখানে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি?

আমর বিন গালিব থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র কাছে হযরত আয়েশা (রা.)'র দোষত্রুটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, দূর হ তুই ধিকৃত, পাপিষ্ঠ! তুই কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিচ্ছিস?

এই ছিল স্মৃতিচারণের কিছু অংশ। অবশিষ্ট যা রয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে তা বর্ণনা করা হবে।

একটি মর্মান্তিক সংবাদও রয়েছে। গত পরশু বুর্কিনা ফাঁসোতে আমাদের ৯জন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। খুবই নৃশংসভাবে তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে। এটি তাদের ঈমানের পরীক্ষাও ছিল যাতে তারা অবিচল থেকেছেন। এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে নয় বরং প্রত্যেককে ডেকে ডেকে শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু যাহোক, ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা কিছু এসেছে, আরো আসছে। এজন্য ইনশাআল্লাহ্ আগামী জুমুআতে বিস্তারিত বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপার আচরণ করুন এবং তাদের সবাইকে মর্যাদায় উন্নীত করুন। দোয়া করতে থাকুন, সেখানকার পরিস্থিতি এখনো এমন যে, যেসব সন্ত্রাসী এসেছিল তারা হুমকি দিয়ে গেছে, যদি পুনরায় মসজিদ খোলা হয় তবে আমরা পুনরায় আসব আর আক্রমণ করব। আল্লাহ্ তা'লা

সেখানকার আহমদীদের তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। যাহোক, আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

(সূত্র কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)